দৈনিক খবর

তারিখ 23 OCT 1991 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

28 ~~160~~ 211

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও তা নিরসনের উপায়

ডঃ শামসুল হুদা চৌধুরী

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আর তা নিরসনের উপায় সম্বন্ধে গত ১০ই জুন একটা প্রতিবেদন লিখতে বসি। কিন্তু পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণের ব্যাপক সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অংগনে নিষ্ক্রিয়তা (বরং বিপরীত তৎপরতা) আমাকে নিরুৎসাহিত ও হতাশ করে।

জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে বিভিন্ন নাটকের অবতারণা সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতকারীদের আরো উৎসাহিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই মাসে সন্ত্রাসের কিছু বিবরণ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ছাপা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ১০ই সেপ্টেম্বর 'সংবাদে' এক সাহসী সম্পাদকীয় একটা আশার আলোর সন্ধান দেয়। ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করুক এটা কেউ পছন্দ করছেন না। সম্পাদক সাহেব লিখেছেনঃ "কোন লুকোচুরির আশ্রয় না নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অংগ সংগঠন বিলুপ্ত করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যার যার দলের শাখা চালু করতে পারে।" সম্পাদক সাহেব এও বলেছেন, "এই ব্যবস্থা শ্রমিক সংগঠনগুলোর ব্যাপারেও প্রযোজ্য।" আমি আরো বলতে চাই, এই ব্যবস্থা যে কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ করা এবং সে মতে চলা যে কোন পূর্ণাঙ্গ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু অধিকারের সংগে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমন্বয় করতে না পারাটাই সমস্ত সমস্যার কারণ।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও অরাজকতা ইদানীংকালে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে ধরনা দেন এবং এই ব্যাধি নিরাময়ের সন্ধান করতে বলেন। তাঁরা এও সুপারিশ করেন যে, দেশের সকল রাজনৈতিক দলের এক মহাসম্মেলন করে সব দলের সমর্থন পেলে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে মহাসম্মেলন ডাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি কথা দিলেন 'বিবেচনা করবেন'। তিনি যথার্থই ব্যবস্থা করলেন। নিজে না ডেকে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে ডাকালেন, কারণ প্রধানমন্ত্রীই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রপতি নহেন। সবাই এক বাক্যে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'সন্ত্রাস বন্ধ করা উচিত।'

মহাসম্মেলন হল। খুব জোরেসোরে সিদ্ধান্ত নেয়া হল এবং এটাকে ফলাও করে প্রচার করা হল। কিন্তু বাস্তবে সন্ত্রাস বেড়ে গেল। প্রতিদিনই কোন না কোন কলেজ বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া যেতে লাগলো। এতদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠনগুলো বিবাদে লিপ্ত ছিল। এখন একই দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়ে কলেজ বন্ধ হওয়ার কারণ হয়ে উঠলো। ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের মুরব্বীদের আর তোয়াক্কা করছিল না। সংবাদ সম্পাদক সত্যিই লিখেছেন (১০-৯-৯১) অনেক সময় ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের উপর মূল রাজনৈতিক দল তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাই ছাত্র সংগঠনের নামে যে অনাচার ও সন্ত্রাস দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাকে পুরোপুরি বন্ধ না করলে আর নিস্তার নেই। আসলে যে সমস্ত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মুষ্টিমেয় আদম সন্তান গোলমালের হোতা তারা বহিরাগত, অছাত্র। প্রকৃত ছাত্ররা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা জীবন নষ্ট করতে চায় না। বরং তারা ঐ মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসকারীদের কাছ থেকে নিরাপত্তা চায়। অবশ্য গাড়ী ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের কাজে কিছুসংখ্যক প্রকৃত ছাত্রকে ঠেলে দেয়া হয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব শুধু পাঠ্যসূচী পড়ানো ও পরীক্ষা নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ভর্তিকৃত ছাত্রকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে প্রকৃত মানুষ বানিয়ে বিদায় করাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই শান্তি-শৃংখলা রক্ষা পাঠদানের চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়।

অতি সম্প্রতি আর একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে মারামারি ও ধ্বংসলীলা শুরু হলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাড়াহুড়া করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগে বাধ্য করতেন। কিন্তু এখন সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীরা তা মানতে রাজী নয়। তারা জোরপূর্বক হলে থাকে বা নতুন করে হলে প্রবেশ করে। তাই কর্তৃপক্ষ বেকায়দায় পড়ে ঘোষণা পরিবর্তন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেন, কিন্তু হল খোলা রেখে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সময়সীমাও আবার কোন সময় বর্ধিত করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হয়? এ সমস্ত ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য মোটেই কার্যকরী হবে না। পুলিশ দিয়ে ছাত্র শায়েস্তা করার মত উদ্ভট কল্পনা যে কেন মনে আসে। শিক্ষার্থীর শাস্তি হবে শিক্ষা বিষয়ক (Academic)। হাঁ, যদি কেউ অছাত্র হয় তবে তাকে ক্যাম্পাসের বাইরে বের করে দিলে পুলিশ বিহিত ব্যবস্থা নিবে। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও শিক্ষার্থীদের ত্রাস চলছে।

এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস নিরসনের উপায়গুলো একে একে তুলে ধরছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঁইন-কানুন ঃ

প্রতি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু আইন বা নীতিমালা (লিখিত বা অলিখিত) আছে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মেনে চলতে হয় ও ভর্তির সময়ে মেনে চলার অংগীকার করে এবং যা লংঘন করলে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তির বিধান আছে। এ সমস্ত বিধি-বিধান যে সকল সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভুল এমন নয়। সময়ের বিবর্তনে প্রয়োজনবোধে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন সম্ভব এবং তা হয়েও থাকে। কিন্তু প্রচলিত বিধি-বিধানগুলো যদি মেনে চলা না যায় তা হলে আইনকে আরো কড়াকড়ি করার প্রশ্ন ওঠে না। তাই সুপারিশ করা হল, প্রচলিত ও বিধিবদ্ধ আইনকে পুরোপুরি মান্য করে চলতে হবে। তাতেও যদি শান্তি-শৃংখলার প্রয়োজনে আরো কিছু সংযোজন দরকার পড়ে তবে তা করা হবে। আর এই আইন মান্য করাতে বাইরের (পুলিশ বিভাগের) সাহায্য মোটেই প্রয়োজন হবে না।

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দুই রকম শিক্ষার্থী আছে- (ক) অনাবাসিক (খ) আবাসিক।

(ক) অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্লাশরুম আর ল্যাবরেটরীর কাজ সেরে নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকে না। অবশ্য মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য লাইব্রেরী বা কমনরুমে অবস্থান করে।

(খ) আবাসিক শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ ক্লাশরুমের বাইরেও দৈনন্দিন চলাফেরা বা থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে তাদের তদারক করতে হয়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবাসিক হলগুলোর ব্যবস্থাপনা মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলে থাকার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ-বিধি অর্ডিন্যান্সের অংশ হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা মেনে চলার অংগীকার করেই ছাত্র-ছাত্রী হলে ভর্তি হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের স্বাধীনতার পর থেকে হল প্রশাসন ক্রমশঃ ঢিলা দিতে দিতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যে, একটা ছাত্রাবাসকে 'ছাত্রাবাস' বলেই মনে হয় না। এখানে ছাত্র-অছাত্র সকলের অবাধ আসা-যাওয়া ও থাকা চলে। হাউস টিউটর পদের কর্মকর্তা হাউসে আসেন না, শুনা যায় আসতে পারেন না। সিট বরাদ্দ বন্টন করার দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু সিট দখল নিয়ে ছাত্ররা মারামারি করে এবং যারা জোরে দখল করতে পারে তারাই থাকে। হাউস টিউটর কোন আপত্তি করেন না। সন্ত্রাসের গোড়াপত্তন ওখানেই।

তাই সুপারিশ করা হল, ছাত্রাবাসে শুধু বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্ররাই থাকবে, অন্য কেউ নয়। আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে আসলে হাউস গেইটে রক্ষিত রেজিস্টারে নাম লিখে ঢুকবেন এবং কখনও রাত্রিযাপন করতে পারবেন না। কোন বন্ধু-বান্ধব 'ডাবলিং' করে থাকতে পারবে না। প্রতি সন্ধ্যায় (৭টায়) উপস্থিতি নিরীক্ষণ (Roll call) নিয়মিত হবে। অনুপস্থিত ছাত্রদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষক ঃ

শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চালিকাশক্তি। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমারত আর চাকচিক্য যতই থাকুক না কেন তার মর্যাদা নির্ভর করে তার শিক্ষকমন্ডলীর গুণাগুণের উপর। তাই আগের দিনে ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যোগাড় করতেন দেশ-বিদেশ বাছাই করে। শিক্ষাদানকে যারা শুধু পেশা হিসেবে না নিয়ে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন, তারা আদর্শ শিক্ষক না হয়ে পারেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চাপের মুখে সামান্য ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে সেটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যেত যদি রাজনৈতিক প্রভাব তাতে যোগ না হত। শিক্ষক মাত্রই শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় ব্যক্তি, এবং শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তোলেন। আজকাল কোন কোন শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শনের কথা শোনা যায়। ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতার ব্যাপারে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেও এ রকম আভাস আছে। তাই শিক্ষকদের মধ্যে যেটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা অনতিবিলম্বে সংশোধন করে নিতে হবে। আর যেটুকু সংশোধনযোগ্য নয় তা উৎখাত করতে হবে।

প্রশাসন ঃ

প্রশাসন বলতে এখানে স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাচ্ছি। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নয়। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, প্রশাসন যন্ত্র নিজের সৃষ্ট আইন-কানুন পুরোপুরি মান্য করছে না বলেই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। তাই প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে আইনের পুরাপুরি বাস্তবায়ন এবং তার সামান্যতম লংঘনকে কঠোর হস্তে দমন। এতেই সমস্ত জঞ্জাল ধুয়ে-মুছে পরিস্কার হয়ে যাবে। আর এরপর যাতে নতুন জঞ্জাল সৃষ্টি না হয় বা নতুন আপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে না পারে সেই লক্ষ্যে প্রশাসনকে যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে রাজনৈতিক প্রভাব যাতে না পড়তে পারে তা খুব সতর্কতার সংগে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে কোন রাজনৈতিক দলাদলির স্থান থাকতে পারবে না। ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি চলবে না। অথবা ... বিশেষের কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার অধিকার থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে হলে ভোটাভুটির মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাই করার বিধান উঠিয়ে দিতে হবে। এতে একজন ভাবী উপাচার্য দল বিশেষের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হন এবং পরে তাঁর কার্যকালে ঐ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে কুন্ঠিত হন না। তাই উপাচার্যের নিয়োগ সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী লোকদের মধ্য থেকে আচার্য কর্তৃক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আচার্য পরামর্শ ও সুপারিশ আহবান করতে পারেন এবং আচার্যের সচিব সেগুলো যথাযথ উপস্থাপন করবেন।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আচার্যের ভূমিকা অতি সামান্যই আছে। দেশের স্বার্থে তাকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আচার্যের পদকে এমন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা দরকার যিনি বাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। কনভোকেশনে সভাপতিত্ব করা ছাড়াও সিন্ডিকেটে উপস্থিত থাকতে পারলে সভাপতিত্ব করার বিধান থাকা উচিত। সত্তর দশকের শেষ দিকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই লাইনে কাজ শুরু করেন এবং দু'জন আচার্য নিয়োগ করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে তাদের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই সব ভন্ডুল হয়ে গেল। তিনি বিভিন্ন জাতের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন মন্ত্রীর সংগে যোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। সুপারিশ করা হচ্ছে যে সারা দেশে বিভিন্ন প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কয়েকজন আচার্য থাকবেন যাঁদের নিয়োগ করবেন দেশের রাষ্ট্রপতি, যিনি মুখ্য আচার্য হিসেবে গণ্য হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপারে আর একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি তার কর্মক্ষমতাকে অনেক গুণ ছাড়িয়ে গেছে। ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় ১৯৩৬ সালে এক বিরাট আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। যেহেতু আবাসিক এবং কোন বাইরের কলেজ তার সংগে যুক্ত ছিল না তাই এর পরিচালনা খুব সুষ্ঠু ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানের সব কলেজের শিক্ষা সংক্রান্ত (Academic) ব্যাপারে দায়িত্ব নেয়ার পর এর চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য পরে আরো দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় এর পরিধি অনেক কমে যায়। তবু এই স্বীকৃতিদান (Affiliation)-এর কাজের মধ্যে ৪টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে (আছে)। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু ঢাকা বিভাগের কলেজগুলোকে স্বীকৃতি দিলে চলবে। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু শিক্ষার প্রসার ঘটেছে অনেক দিকে (যেমন স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকোত্তর প্রচলিত প্রথা ও সেমিস্টার প্রথা এবং অনাবাসিক, আবাসিক ইত্যাদি) অতএব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুচারুরূপে চালাতে হলে এদের বাস্তবভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আলাদা করে নিতে হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ বিভাগের জন্য Affiliating বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা করে দিবে এবং নিজ নিজ ক্যাম্পাসে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখবে। এতে শান্তি-শৃংখলা অতি সহজে বলবৎ রাখা যাবে। ক্যাম্পাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভূক্ত নিরাপত্তা বাহিনী যথেষ্ট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশে আলাদা করে 'বাংলাদেশ অনানুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে রূপ দেয়া যায়।

উপরের সুপারিশ যদি গ্রহণ করা হয়; তা হলে বর্তমানে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে ১৪টি ঃ

১। ঢাকা স্বীকৃতিদানকারী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয়।

২। রাজশাহী স্বীকৃতিদানকারী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। চট্টগ্রাম স্বীকৃতিদানকারী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। খুলনা স্বীকৃতিদানকারী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। ঢাকা বা বাংলাদেশ অনানুষ্ঠানিক (Nonformal) বিশ্ববিদ্যালয়।

৬। ঢাকা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential)

৭। জাহাঙ্গীরনগর আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential)।

৮ রাজশাহী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential)।

৯। চট্টগ্রাম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential)।

১০। খুলনা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential)।

১১। শান্তিডাংগা দুলালপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া।

১২। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-ময়মনসিংহ।

১৩। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাকা।

১৪। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-সিলেট।

এছাড়াও একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী অনেক দিন যাবৎ ছিল এবং বর্তমান গণতন্ত্রী সরকার এর বাস্তবায়নে কথা দিয়েছেন। তাই ১৫নং আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গণ্য করে সামগ্রিক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা যায়। অবস্থা বিবেচনায় নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। আবার উপরে বর্ণিত কিছু কিছু খন্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়কে সমন্বিত করা যেতে পারে। ৬নং ও ৭ নংকে এবং ১০ নং ও ১১ নংকে একই প্রশাসনের ভিতর আনা যেতে পারে। (লেখক ১৯৮৪ সালে অবসরপ্রাপ্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ও ডীন)

P.T.O

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...